কেন্দ্রের সদ্য-প্রস্তাবিত পরিবর্তিত অরণ্য আইনে জঙ্গল ধ্বংস করে শহরাঞ্চল গড়ে তোলা জলবৎ তরলং

যা ঘটতে চলেছে, তাকেও উন্নয়ন বলা হবে?

বনবাসীদের মতামত দেওয়ার অধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রস্তাব। অন্য দিকে, গভীর অরণ্যের ক্ষেত্রফল ক্রমশ কমছে ভারতে। এ বড় সুখের সময় নয়। লিখছেন

দীপায়ন দে

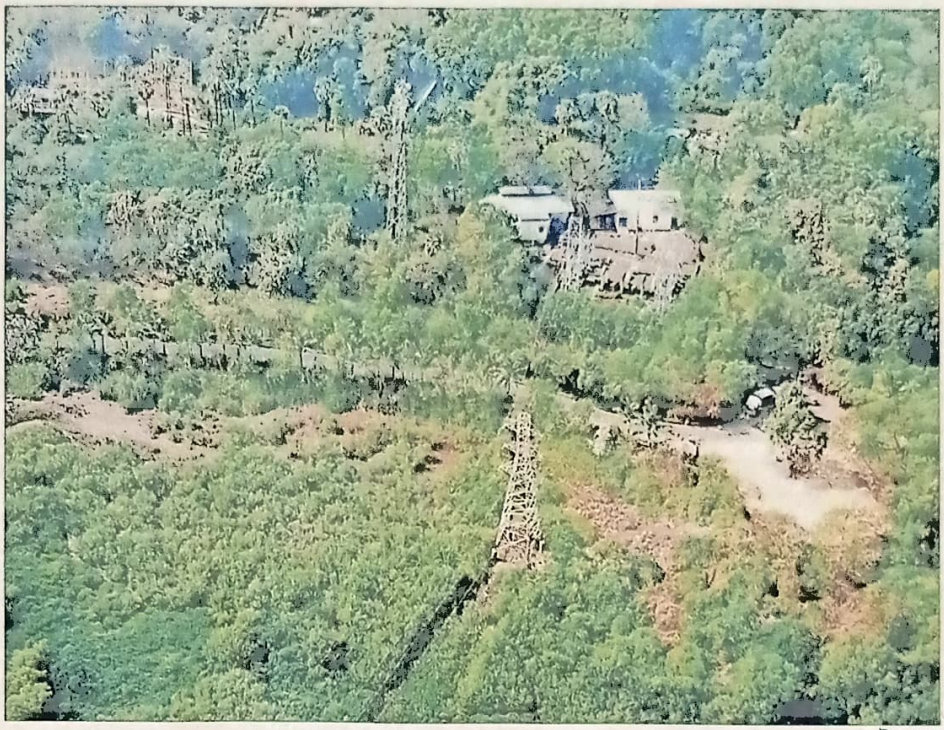

উমা কদম

'জঙ্গলের অধিকার' নিয়ে কথা বলার অধিকার কার আছে? বনবাসী জনজাতির না আমলাদের? সংসদের বাদল অধিবেশনে যখন সদ্য প্রস্তাবিত জঙ্গল সংরক্ষণ নিয়মাবলী আলোচিত হল এবং আদিবাসী জনজাতির অধিকার খর্ব করার কথা উঠবে তখন কিন্তু সেই বিতর্কে জনজাতির কোনও প্রতিনিধি অথবা আমরা কেউই ছিলাম না। আমাদের হয়ে যাঁরা প্রতিনিধিত্ব করবেন তারা সকলেই তাঁদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনে ব্যস্ত থাকবেন। এটাই গণতন্ত্র। কিন্তু তাতে আমাদের কি কিছু যায় আসে? সে কথা বিবেচনা করতেই এই লেখার উপস্থাপনা।

সংরক্ষণ ও অধিকার

জঙ্গলের অধিকার মূলত সেই মানবাধিকার যার দৌলতে ভারতের বনবাসী সম্প্রদায় এবং জঙ্গলের জনজাতি তাঁদের জীবন জীবিকার জন্য বনানীর সামগ্রী এবং সেই বাস্তুতন্ত্রের পরিষেবা ব্যবহার করতে পারেন। পরিবর্তে বনানী সংরক্ষণের দায়-দায়িত্ব তাঁদের। এই বিষয়ব্যবস্থায় 'সংরক্ষণ' এবং 'অধিকার' আপাতদৃষ্টিতে পরিপূরক হলেও স্বার্থের সংঘাত এখানে সমানুপাতিক ভাবে জড়িত। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে এবং সুস্থায়ী পরিবেশ নীতির প্রণয়নে বিভিন্ন আর্থসামাজিক রদবদল এই সংঘাতকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। আটের দশকে প্রণীত বনসংরক্ষণ নীতিমালায় এই দ্বন্দ্বের সময়োচিত সমাধান সূত্র ছিল না এবং সেই মান্ধাতা আমলের বননীতির যথাযথ পরিবর্তনের রাজনৈতিক সদিচ্ছাও আজ পর্যন্ত কোনও সরকার দেখায়নি। এরই মধ্যে আমাদের গ্রাস করেছে উপভোক্তা-সর্বস্ব অর্থনীতি, বিচ্ছিন্নতাবাদ, সামরিক আগ্রাসন এবং রাজনৈতিক অনৈতিকতা। এই নিরিখে যদি সদ্য-প্রস্তাবিত বননীতিকে দেখা যায়, তা হলে তিনটে বিষয় উঠে আসে।

ব্রাত্য বনবাসী

প্রথমত, সরকারের নতুন নিয়ম মাফিক জঙ্গল হাসিলের পদ্ধতি এখন 'জলবৎ তরলং' হয়ে গেল এবং রাতারাতি বনাঞ্চল মুছে গিয়ে শহরাঞ্চল গড়ে উঠতে পারে। ২০০৩-এর বন সংরক্ষণ আইনে কোনও বনভূমির চরিত্র বদল করতে গেলে সেই প্রস্তাব বন মন্ত্রক এবং রাজ্য সরকার উভয়ই মূল্যায়ন করত, ব্লক পর্যায়ের জনজাতি প্রতিনিধিদের সঙ্গে সেই প্রস্তাব আলোচিত হত এবং তার পর তা পেশ করা হত বিশেষ উপদেষ্টামণ্ডলীর কাছে। পরিবর্তিত নিয়মে তা এখন সরাসরি বন মন্ত্রকই অনুমোদন করে দিতে পারবে। যদিও এই অনুমোদন প্রক্রিয়ায় একগুচ্ছ আধিকারিক এবং ক্ষেত্রীয় কমিটি যুক্ত থাকবেন, কিন্তু তাঁরা সব্বাই কাজ করবেন বন মন্ত্রকের ব্যুরোক্রেসির আঁচলের তলায়। এই নিয়মাবলী অনুযায়ী ৫ হেক্টর বা তারও বেশি বনভূমিকে যদি মাইনিং এবং খননের কাজে ব্যবহার করার অনুমতি চাওয়া হয় অথবা যদি সেই বনভূমির সংরক্ষণ বাতিল করতে হয় তা হলেই তা উপদেষ্টামণ্ডলীর নির্দেশে হবে। আরও বলা হয়েছে যে বনভূমির চরিত্র পরিবর্তন করতে প্রয়োজনে সেখানকার সমস্ত বনানী এবং উদ্ভিদ পুড়িয়ে বা উপড়িয়ে নির্মূল করে ফেলা যাবে। অবশ্য এই পরিবর্তন বাবদ প্রদেয় শুল্ক বন মন্ত্রকের হাতে তুলে দিতে হবে অন্যত্র বনসৃজনের জন্য। এই বনসৃজন আবার যে কোনও সবুজায়নের মাধ্যমেই হতে পারে, তাতে বনভূমির বাস্তুতন্ত্র পুনর্নির্মিত হল কিনা এবং পরিষেবা পুনরুদ্ধার করা গেল কিনা, তা নিয়ে কোনও মাথাব্যথা মন্ত্রকের থাকবে না।

অর্থাৎ, বনবাসী জনজাতির মতামত নেওয়ার বা বক্তব্য রাখার কোনও বিধানই আর রইল না। আচ্ছা, এই বিধান কি আগের নিয়মে ছিল? ছিল হয়ত, শুধু কাগজে কলমে। সেই অধিকারহীনতাই এবার বৈধ হয়ে যাবে।

অরণ্যের সংকোচন

দ্বিতীয়ত, জঙ্গল নিয়েই যখন কথা হচ্ছে তখন একটু জঙ্গলের পরিসংখ্যান আলোচনা করা প্রয়োজন। ২০২১-এর ফরেস্ট সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী, বিগত দু'বছরে জঙ্গল বেড়েছে ২২৬১ বর্গ কিলোমিটার, যার প্রায় সবটাই মুক্ত বনাঞ্চল, অর্থাৎ যেখানে গড়ে ২৫ শতাংশ ভূমি বনাচ্ছাদিত হয়ে আছে। অথচ, যে অঞ্চলে বনাচ্ছাদন প্রায় ৬০ শতাংশ, সেখানে বনভূমি কমেছে ১৫৮৩ বর্গ কিমি। বোঝাই যায়, সামাজিক বনসৃজন এবং যে কোনও উদ্ভিদ-পরিবৃত অঞ্চলই উপগ্রহ চিত্রে বনাঞ্চল বলে প্রতিভাত। তাই বেড়ে গেছে বনভূমির ক্ষেত্রফল।

নজরে উত্তর-পূর্ব

এ বনরাজি, যদিও সেই শাশ্বত জঙ্গল নয়। ভৌগোলিক চিত্রে, জঙ্গল লোকসানের বৃহৎ ক্ষেত্র হল উত্তর-পূর্ব ভারতের সাত রাজ্য, এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্ত ক্ষেত্রগুলো। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে যে এই জঙ্গল হাসিল কি সামরিক তৎপরতার মাশুল?

'ক্লিয়ার ফেলিং' পর্যবসিত হয়েছে 'ক্লিয়ার কাট' পদ্ধতিতে। অর্থাৎ সব কেটে ছেঁটে বনভূমির মেঝে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে ফেলা। রাশিয়ার বিস্তীর্ণ বনভূমি এই 'ক্লিয়ার কাট'-এর শিকার। ভারতেও এখন তাই-ই প্রায় বৈধতা পেয়ে যাবে।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং পরিবেশ সংরক্ষণের যে একটা গূঢ় সম্পর্ক ইদানিং তৈরি হয়েছে, সে কথা কিন্তু সত্যি। উত্তর-পূর্ব ভারতের ভঙ্গুর বাস্তুতন্ত্রে তোলপাড় চলেছে বিগত পাঁচ-সাত বছর ধরে। অরুণাচলে চিনের আগ্রাসন, বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্তবর্তী এলাকায় উত্তেজনা যেমন এক দিকে সামরিক প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়েছে, তেমনই নয়া নাগরিক আইনের হলকায় উত্তর-পূর্বে আবার মাথাচাড়া দিয়েছে বিচ্ছিন্নতাবাদ, সামাজিক বৈষম্য এবং বিভেদের অবিশ্বাস। এর পর মণিপুর, মিজোরাম বা নাগাল্যান্ডের জনজাতিরা যে দিন তাদের অরণ্যের অধিকারটুকুও হারাবে সে দিন এই বিচ্ছিন্নতাবাদ কি আরও প্রবল আকার নেবে না?

উত্তর-পূর্ব ভারতে কী করে এক ঢিলে দুই পাখি বধ করা যায় তারই মতলব আঁটছে প্রশাসন। যেমন নগরোন্নয়নের লোভ দেখানো হয়েছে, তেমনই সামরিক শক্তিবর্ধন করতে পাহাড় চিরে তৈরি হচ্ছে ৪০০০ কিমি চার-লেনের হাইওয়ে, ২০টা রেল স্টেশন এবং শতাধিক সামরিক ঘাঁটি। জঙ্গলের সর্বনাশ তো অনিবার্য, কিন্তু দেশের সুরক্ষা, নাগরিক সুরক্ষা, শান্তি এবং উন্নয়ন কি সুনিশ্চিত করা গেল তাতে?

আর একটা দিক ভাবা দরকার, এই তথাকথিত উন্নয়নের যে ব্যয়ভার সরকার বহন করছে, এই কর্মকাণ্ডে এবং সামরিক প্রস্তুতিতে যে রাজস্ব বিনিয়োগ করা হচ্ছে, তার পুনরুদ্ধার করতে গেলে চাই পুঁজিনিবেশ, ব্যবসা, বিদেশি ও বেসরকারি লগ্নি, জমি এবং কৌশলগত বিলগ্নিকরণ। সেখানে যদি সামুদায়িক বনবিধি বা যৌথ বনসংরক্ষণের বাঁধনে সব লাটে ওঠে তা হলে কী হবে? মানবাধিকার এমনিতেই লঙ্ঘিত হচ্ছে যখন সারা দেশে, তখন আর একটু না হয় হোক। যাক জঙ্গল।

বৃক্ষচ্ছেদে ভুল

তৃতীয় সংকটটি একা ভারতের নয়, সারা বিশ্বের। বন সংরক্ষণের নিয়ম অনুযায়ী, সারা বিশ্বেই 'ক্লিয়ার ফেলিং' পদ্ধতিকেই মোটামুটি মেনে চলা হত, যেখানে এক বা একাধিক পরিপক্ক বনরাজির সমান বা সমান-উৎপাদনশীল বনাঞ্চলগুলিকে প্রায়শই প্রাকৃতিক ভাবে এবং কখনও কখনও কৃত্রিম ভাবে ক্রমাগত পরিষ্কার করা হয়, যাতে নতুন বনরাজি সৃষ্টি হয়, বনের জৈববৈচিত্র সুস্থায়ী হয়। উপকৃত হয় বনবাসী সম্প্রদায়গুলি। বর্তমানে, এই 'ক্লিয়ার ফেলিং' পর্যবসিত হয়েছে 'ক্লিয়ার কাট' পদ্ধতিতে। অর্থাৎ সব কেটে ছেঁটে বনভূমির মেঝে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে ফেলা। অ্যামাজনের জঙ্গল, কেনিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং রাশিয়ার বিস্তীর্ণ বনভূমি এই 'ক্লিয়ার কাট'-এর শিকার। ভারতেও এখন তাই-ই প্রায় বৈধতা পেয়ে যাবে। এই 'জঙ্গল-হাসিল'-এর ব্যবহারিক নাম দেওয়া হয়েছিল 'রেড' (REDD)। সারা বিশ্বে প্রচুর আন্দোলন হয়, বিতর্ক হয়, প্রতিবাদ হয় এই প্রকল্পকে গুটিয়ে ফেলার জন্য। পরবর্তিকালে এই প্রকল্প পরিবর্তিত করে বলা হয় যে, বনবাসী জনজাতিকে আগে প্রস্তুত করতে হবে যাতে তারা এই প্রকল্পে সমানাধিকার পায়। অতএব, প্রকল্পের নাম বদলে রাখা হল রেড-প্লাস। প্রভূত অর্থ বরাদ্দ করা হল ছোটো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে, এই প্রস্তুতির জন্য। ভারতও পেয়েছে সেই সাহায্য কিন্তু প্রস্তুত করে তুলতে পারেনি বনাঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দদের। নাকি চাইনি?

শেষের সে দিন?

একের পর এক জলবায়ু সম্মেলনের বিফলতা জানান দিচ্ছে যে পরিবেশ নিয়ে একমত হওয়াটা অ্যাজেন্ডা নয়। তাই এক দিকে যেমন খাতায় কলমে বনভূমি লাফিয়ে বেড়ে চলেছে, অন্য দিকে বনের মেঝে সাফাই করে প্রস্তুতি চলেছে বেসরকারি পুঁজিনিবেশের, সামরিক শক্তি সংগ্রহের। বুঝতে পারি না, আমরা কোন প্রহেলিকায় বিভ্রান্ত। ঘাড় ঘোরালেই চোখে পড়ে, ভুটানের ৭৩ শতাংশ বনভূমি আর তার 'গ্রস ন্যাশনাল হ্যাপিনেস'। থাইল্যান্ডের পার্বত্য অঞ্চলে শিক্ষা আর স্বাস্থ্য পৌঁছে দিতে টেলিমেডিসিন আর অন-লাইন পড়া শুরু ২০০৭-এ, কম্যুনিটি টেলিভিশন দিয়ে। আজও সেখানে প্রান্তিক চাষির বাড়ি বয়ে গিয়ে জানতে চাওয়া হয় সে কী ফসল লাগাবে এবার। প্রতিবেশী বাংলাদেশকে দেখি, বিশ্বব্যাঙ্কের প্রস্তাব প্রত্যাখান করে পদ্মাসেতু বানাচ্ছে নিজের দেশের টাকায়। আবার এও দেখি, শ্রীলঙ্কায় সাধারণ মানুষের দুর্গতি, তাদের প্রতিহিংসা। দেখি পাকিস্তানের মুহ্যমান অর্থনীতি। খোঁজার চেষ্টা করি আমার দেশের কৌশল। গ্রামীণ ভারতের দারিদ্র চোখে পড়ছে এখনও। হাত পড়ছে প্রাকৃতিক রসদে। বুঝতে পারি না এটা কোন উন্নয়ন। আসলে হয়তো দেশের নেতৃত্বের 'ভিশন'টা অনেক বড়, আমাদের মতো সাধারণের চোখে পড়ে না। অনেকটা টাইটানিকের মতন। ডুবে গেলে বোঝা যাবে, হ্যাঁ ছিল বটে একখানা।

লেখক সাউথ এশিয়ান ফোরাম ফর এনভায়রনমেন্ট-এর কর্ণধার